গাভী পালন

গাভীর উন্নত জাত, উন্নত জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা:

গাভীর উন্নত জাত নির্বাচন:

- আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে দুধ উৎপন্ন করে এমন গরুর জাত হিসেবে শাহীওয়াল, সিন্ধি, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান শংকর জাতের গরু বহুল পরিচিত।
- দেশী জাতের মধ্যে শাহজাদপুর, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর এবং চট্টগ্রাম এলাকায় গরু দেশের অন্যান্য এলাকার গরু অপেক্ষা উন্নত ও দুধ বেশী দেয়।

খাঁটি জাতের শাহিওয়াল গরুর বৈশিষ্ট্য:

- শাহিওয়াল গরুর দেহের রং হালকা লাল বা বাদামী রঙ্গের;
- এদের কুঁজ কিছুটা উঁচু এবং গল কম্বল বড় ও ঝুলানো হয়। নাভী ও বেশ ঝুলানো থাকে;
- এ জাতের গরুর মাথা খাটো, শিং ছোট, কপাল ও দুই শিং এর মধ্যবর্তী স্থান উঁচু হয়;
- এ জাতের একটি গাভীর ওজন ৪০০-৫০০ কেজি হয়ে থাকে;
- একটি গাভী বছরে ৩০০ দিন পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে;
- প্রতি গাভী হতে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ লিটার দুধ পাওয়া যা; এবং
- এ জাতের বকনা ২-২.৫ বছর বয়সে প্রথম প্রজনন উপযুক্ত হয়।

খাঁটি জাতের ফ্রিজিয়ান গরুর বৈশিষ্ট্য:

- ফ্রিজিয়ান জাতের গরু আকারে অনেক বড় হয়;
- এদের কূঁজ উঁচু হয় না;
- এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা-কালো মিশানো হয়;
- এ জাতের একটি ষাঁড়ের ওজন ৮০০-৯০০ কেজি এবং গাভীর ৫০০-৬০০ কেজি, এমনকি আরও বেশী হয়ে থাকে। এ জাতের গরু থেকে মাংসও বেশী পাওয়া যায়;
- এ জাতের গাভী অনেক বেশী দুধ দেয়, একটি গাভী দিনে ২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার পর থেকৈ পরবর্তী বাচ্চা প্রদান পর্যন্ত একটানা দুধ দিয়ে থাকে;
- এ জাতের বকনা অল্প বয়সে অর্থাৎ প্রায় ২.৫ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বছর বাচ্চা দেয়।

শংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য:

- আমাদের দেশে প্রায় বেশীর ভাগই গরুই দেশী জাতের;
- দেশী জাতের গরু থেকে দুধ ও মাংস উৎপাদন পাওয়া যায় কম, কিন্তু এদের কাজ করার ক্ষমতা তুলনামূলক বেশী;
- বিদেশী উন্নত জাতের গাভী হতে অনেক বেশী দুধ পাওয়া যায়; কিন্তু এসব বিদেশী জাতের গাভী আমাদের দেশের জলবায়ূ ও আবহাওয়ায় এবং গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা লালন উপযোগী নয়;
- আমাদের দেশে তাই বিদেশী ও দেশী জাতের সংমিশ্রণে শংকর জাতের গরু পালনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়;
- শংকর জাতের গাভী আমাদের দেশের জলবায়ু ও আবহওয়ায় এবং গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় উপযোগী ।

ভাল দুগ্ধবতী গাভীর বৈশিষ্ট্য:

- দেহের সম্মুখভাগ হালকা ও পেছনের অংশ ভারি হবে এবং শরীরের গঠন ঢিলে-ঢালা হবে, চামড়া পাতলা হবে, দেহে অপ্রয়োজনীয় চর্বি থাকবে না।
- ওলান বড় হবে এবং দেহের সাথে সুন্দরভাবে লেগে থাকবে। ওলানের গঠন সুন্দর এবং বাঁটগুলো একই আকারের এবং সুন্দরভাবে একই দূরত্বে সাজানো থাকবে। ওলানের গঠন দেখে দুধ উৎপাদন সর্ম্পকে ধারণা করা যাবে।
- দুধের শিরাগুলো মোটা ও স্পষ্ট হবে এবং নাভির দু'পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকাভাবে ছড়িয়ে থাকবে। দুধের শিরাগুলো ওলানেও স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।
- উন্নত জাতের গাভী প্রতিবছর বাচ্চা দেয়।

গরুর স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ:

গরুর স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান সর্ম্পকে যে সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে:
গাভীর ঘর নির্মাণের জন্য উঁচু সমতলে ভূমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না এবং পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা আছে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। গাভীর ঘর নির্মাণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে ঘর নির্মাণ করতে হবে:

- গাভীর স্বাস্থ্য ও আরাম,
- সহজ প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার,
- উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মাবলী পালন করার সুবিধা।

গরুর বাসস্থান (গোয়ালঘর) নির্মাণে যে সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে-

- গোয়ালঘর সাধারণত দক্ষিণমূখী হওয়া ভাল;
- গোয়ালঘর সমতল ভূমি থেকে এক ফুট উঁচুতে শুকনা স্থানে হতে হবে;
- মেঝে হালকা ঢালু থাকবে যাতে সহজেই গরুর চনা কিনারে চলে যায় এবং ঘর শুকনো থাকে;
- এক চালা ঘরের উচ্চতা সাধারণত ৮-১০ ফুট এবং দু'চালা ঘরে মধ্যবর্তী উভয় চালের শীর্ষদেশ ১৪ ফুট এবং ঢালু অংশের উচ্চতা ৭ ফুট হওয়া প্রয়োজন;
- ঘরের চাল এসবেসটস দ্বারা নির্মাণ করা হলে ভাল হয়, এতে ঘর শীত/গরম উভয় ক্ষেত্র গরুর বসবাসের জন্য আরামদায়ক হবে;
- একটি বয়স্ক গরুর জন্য অন্তত ৩ ফুট প্রস্থ ও ৫ ফুট দৈর্ঘ্য জায়গা প্রয়োজন। তার সাথে ম্যানজারের জন্য ২ ফুট এবং ও ড্রেনের জন্য ১ ফুট প্রশস্ত জায়গা লাগবে;
- ৪/৫ টি গরু হলে এক সারিতে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য একচালা একটি ঘরই যথেষ্ট;
- ৮/১০ বা অধিক গরু হলে দু'চালা ঘর নির্মাণ করতে হবে এবং গুরুকে ঘরে দুই সারিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
- উভয় সারির গরুর সম্মুখে খাদ্য দেয়ার জন্য কমন খাবার পাত্র/ম্যানজার থাকবে। এ ক্ষেত্রে উভয় সারির গরুর পিছনের ভাগ বহির্মুখী এবং সামনের ভাগ অন্তর্মুখী হবে;
- শংকর জাতের গরু অধিক গরমে কাতর, তাই গোয়ালঘর শীতল রাখার জন্য ঘরে সিলিং, উত্তর-দক্ষিণে খোলা, আলো-বাতাস পূর্ণ এবং প্রয়োজনে ফ্যান এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- শীতকালে প্রয়োজনে গরুর গায়ে ছালার ব্যবস্থা ও মেঝেতে শুকনো খড়ের বিছানা করতে হবে;
- সম্ভব হলে বাছুর গরুর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং
- বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

গরুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা:

গরুর বিভিন্ন প্রকারের রোগ হতে পারে। উক্ত রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ভাইরাস জনিত রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। উক্ত রোগে আক্রান্ত গরু যাতে ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণু দ্বারা দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয়ে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ভাইরাস জনিত রোগরও চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তবে যে কোন রোগ হওয়ার আগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। তাই যে সকল সংক্রামক রোগ এর কারণে গরুর মৃত্যুর সম্ভবনা রয়েছে সে সকল রোগের প্রতিকার হিসেবে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গরুকে টিকা প্রদানের সময় একটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে টিকা প্রদান করা। তা না হলে প্রদত্ত টিকা থেকে আশানুরুপ ফল পাওয়া যাবে না। অসুস্থ গরুকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত টিকা প্রদান করা ঠিক হবে না। তাছাড়া টিকা প্রদানের পূর্বে গরুকে কৃমি মুক্ত করতে হবে। তা করা হলে প্রদানকৃত টিকা থেকে উত্তম ফল (Antibody) পাওয়া যাবে। পানির প্রতি মহিষের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তাই নদী মহিষ পরিষ্কার পানি ও জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে নদী-ডোবা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে মহিষ রেখে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দু'বার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে।

ক্ষুরা রোগ (Foot-and-mouth disese/hoof-and-mouth disease/FMD)

এটি ভাইরাস জনিত একটি মারাত্নক সংক্রামক রোগ। গ্রামে কোথাও কোথাও এ রোগকে ক্ষুরাচল, চপচপিয়া, বাতা বা বাতনা রোগ বলা হয়ে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট গরু এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগ বিস্তার:

- রোগাক্রান্ত গরু থেকে বাতাসের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে।
- ক্ষুরা রোগের জীবাণু দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ:

- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়;
- মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়;
- মুখে ঘা হওয়ায় মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং এ অবস্থায় গরু খেতে পারে না;
- পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় তীব্র ব্যথা হয় ও হাঁটাতে/কাজ করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে;
- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়; এবং
- এ রোগে বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

রোগের প্রতিকার:

- অসুস্থ গরুকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখা;
- রোগ হওয়ার আগেই সুস্থ সকল গরুকে ক্ষুরা রোগের টিকা দেয়া;
- প্রতিদিন গোয়াল ঘর জীবানুনাশক যেমন ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে দেওয়া;
- গরুকে নরম খাদ্য সরবরাহ করা; এবং
- গরুর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা।

তড়কা রোগ (Anthrax):

এ রোগ ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতি তীব্র ও মারাত্নক সংক্রামক রোগ। গরুর দেহে সাধারণত খাবারের সাথে এ রোগ প্রবেশ করে। মাটিতে এ রোগের জীবাণু বহু বছর বেঁচে থাকে।

রোগ বিস্তার:

- সাধারণত: বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগরে প্রাদুর্ভাক ঘটে;
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবানু থাকার সম্ভবনা থাকে;
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই ভিজে যাওয়া খড় খাওয়ালে এই রোগ হতে পারে;
- তড়কায় আক্রান্ত মৃত গরুর মাংশ কুকুর ও শৃগাল খেয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এই রোগ ছড়ায়;
- মৃত পশুর চামড়া থেকেও এই রোগ ছড়ায়;
- তড়কা রোগে আক্রান্ত গরুর মৃতদেহ যে মাঠে রাখা হয়, তার চুতর্দিকের ঘাস খেলেও এই রোগ হতে পারে; এবং
- তড়কা রোগের জীবাণু দ্বারা পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- এ রোগ অতি তীব্র প্রকৃতির হলে গরু দ্রুত নি:শ্বাস নেয় ও কৃষক/খামারী কিছু বুঝার আগেই অসুস্থ গরুর দেহ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়;
- রোগ তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যা। জ্বর হবে ১০৪-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এ সময়ে গরুর শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মাংস পেশীর কম্পন শুরু হয়;
- গরুর চোখের পর্দা লাল হয়ে যায় এবং দ্রুত নি:শ্বাস নিতে থাকে (মিনিটে ৮০-৯০ বার) এবং
- এক পর্যায়ে অল্প সময়ে গরুটি মাটিতে পড়ে যাবে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে মারা যাবে।

তড়কা রোগে মৃত গরুর লক্ষণ:

- মৃত গরুর নাক, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে আলকাতরার মত জমাটবিহীন রক্ত বের হবে;
- মৃত গরুর দেহ শক্ত হবে না; এবং
- মৃত গরুর পেট খুব দ্রুত ফুলে যাবে।

রোগের প্রতিকার:

- এ রোগের জীবাণু সহজে মরে না, তাই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে মৃত গরুকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে;
- কোন অবস্থাতেই মৃত গরু পানিতে ফেলা যাবে না এবং মুচিকে দেওয়া যাবে না;

- আক্রান্ত গরুকে আলাদা রাখতে হবে ও সুস্থ গরুকে তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে; এবং
- তড়কা রোগে আক্রান্ত এলাকায় এ রোগ ছাগল/ভেড়াতেও হতে পারে, তবে ছাগল/ভেড়ায় এ রোগের টিকা প্রদান করলে মারাত্নক সমস্যাও হতে পারে। কেননা এ টিকা প্রদান স্থানে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব হয়, তখন ছাগল/ভেড়া লাফালাফি শুরু করে দেয় এবং কখনও মারাও যেতে পারে। তাই অতি প্রয়োজন হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে ছাগল/ভেড়াকে এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

বাদলা রোগ: (Black Quarter/B.Q):

এর রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্নক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে এ রোগ বৃষ্টি বাদলের মৌসুমে বেশী হয় বলে এ রোগকে বাংলায় বাদলা রোগ বলা হয়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বয়সের যে সমস্ত গরুর স্বাস্থ্য ভাল, তাদের এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এ রোগে মৃত্যুর হার বেশী হয়।

রোগ বিস্তার:

- সাধারণত: বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে;
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবানু থাকার সম্ভাবনা থাকে;
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই পানিতে ডোবা ঘাস খাওয়ালে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- বাদলা রোগের জীবাণু দ্বারা দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে;
- তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা দেখা দিবে;
- জ্বর হবে এবং তা ১০৪ ডিগ্রি হতে ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে;
- এই রোগে সাধারণত গরুর উরু, ঘাড়, কাঁধ ও কোমরের মাংশ আক্রান্ত হয়ে ফুলে উঠে;
- আক্রান্ত ফুলা স্থান কালচে দেখাবে এবং ফুলাস্থান গরম ও বেদনাদায়ক হবে;
- আক্রান্ত মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হবে যা দ্বারা সহজেই বাদলা রোগ বুঝা যাবে;
- গরু হাঁটতে পারবে না বা খুঁড়িয়ে হাঁটবে; এবং
- চিকিৎসায় বিলম্ব হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যাবে।

রোগের প্রতিকার:

- আক্রান্ত গরুকে আলাদা রাখতে হবে;
- মৃত গরুকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে;
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না;
- পঁচা পুকুর, নালা এবং ডোবার পানি খাওয়ানো যাবে না;
- পঁচা ঘাস এবং পানির নিচের ঘাস খাওয়ানো যাবে না; এবং
- বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সকল সুস্থ গরুকে বাদলা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গলাফুলা রোগ: (Hemorrhagic septicemia/HS)

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্নক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে প্রায় সকল ঋতুতে এই রোগ হয়। তবে বর্ষাকালে যখন গরু/মহিষকে দিয়ে বেশি কাজ করানো হয় তখন এ রোগ বেশী হয়। বর্ষার শুরু এবং শেষে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। এ রোগ ডুবো অঞ্চলে বেশি হয় এবং মৃত্যুর হারও অনেক বেশী।

রোগ বিস্তার:

- সুস্থ গরু আক্রান্ত গরুর মলমূত্র দিয়ে এবং দূষিত খাদ্য ও পানি খেয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়;
- গরুর দেহে এই রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকতে পারে। কোন কারণে যদি ঐ গরুটি পীড়ার সম্মুখীন হয় যেমন, ঠান্ডা, অধিক গরম, ভ্রমনজনিত দুর্বলতা থাকে, তখন গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে গরুটি এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়;
- দীর্ঘদিন পুষ্টিহীনতায় ভুগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে;
- বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিতে ভিজলে এবং ঠান্ডা লাগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে;

- গরুকে কষ্টের সাথে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- গরম এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে গরুর জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায় (জ্বর ১০৫ ডিগ্রি -১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট);
- ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মারা যায়;
- তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক, পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। এ অবস্থাতেই শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং গরু গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়;
- গলা ও গলকম্বল ফুলে যাবে, ফুলা জায়গায় টিপ দিলে ব্যাথা পাবে এবং বসে যাবে। গরম ও শক্ত হবে;
- শ্বাস নেওয়ার সময় ঘড় ঘড় আওয়াজ হবে; এবং
- কখনও কখনও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

রোগের প্রতিকার:

- আক্রান্ত গরুকে আলাদা রাখতে হবে;
- মৃত গরুকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে;
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না; এবং
- সব গরুকে সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গাভীর ওলান ফুলা রোগ বা ওলান প্রদাহ (Mastitis):

বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা এই রোগ হয়। গাভীর জন্য এ রোগ একটি মারাত্নক রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে গাভীর ওলান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রোগ বিস্তার:

- ওলান বা বাঁটে যে কোন প্রকার আঘাত বা ক্ষত থাকলে সেখান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া সহজেই প্রেবেশ করে এ রোগ সৃষ্টি করে;
- অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, ময়লা, গোবর ইত্যাদির উপর গাভী শয়ন করলে;
- বাচ্চা প্রসবের পর ওলানে ময়লা লাগলে এবং তা সময়মত পরিস্কার করা না হলে;
- ঘাসের চটা ওলানে প্রবেশ করালে;
- গোয়ালার অপরিস্কার হাত ও বড় নখ দ্বারা গাভীর ওলানে ক্ষত হলে; এবং
- বাছুর ওলানে জোরে গুতো মারলে।

রোগের লক্ষণ:

- অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হবে;
- দুধের রং পরিবর্তন হবে, দুধের সাথে রক্ত বের হবে;
- ওলান ফুলে যাবে, গরম থাকবে এবং শক্ত হয়ে যাবে;
- গরুর ওলানে ব্যাথা অনুভব করে, ফলে ওলানের মধ্যে হাত দিতে দেবে না;
- দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যাবে ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হবে;
- ক্ষুধামন্দা অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হবে; এবং
- গাভী হাঁটতে চাইবে না বা খুব ধীরে ধীরে হাঁটবে।

রোগের প্রতিকার:

- আক্রান্ত গাভীকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে;
- গাভীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে;
- ওলানে ঘাসের চটা প্রবেশ করান চলবে না;
- ময়লা যেন ওলানে না লাগে সেদিকে প্রসবোত্তর খেয়াল রাখতে হবে;
- গাভীকে খালি পেটে দুধ দোহন করাতে হবে, কেননা ঘাস পানি খেয়ে ভরা পেটে দুধ দোহন করা হলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এবং

- এ রোগ প্রতিকার করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

তবে দুধ দোহনের পর জীবানুনাশক ঔষধ পানির সাথে মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

নাভীতে ঘাঁ রোগ: (Neval ill)

এ রোগ ব্যাটেরিয়া জনিত কারণে ঘটে। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে বাছুরের স্বাস্থ্যহানী হবে, যা পরবর্তীতে বাছুরের সাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাবে।

রোগ বিস্তার:

- প্রসবের পর বাছুরের নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে না ধুলে এবং কাঁচা নাভীতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে;
- গরুর ময়লাযুক্ত জায়গায় বাছুর শয়ন করলে;
- নাভী শুকাতে কয়েকদিন সময় লাগে, এ সময়ের মধ্যে নাভীতে মাছি বসলে; এবং
- অনেক সময় গাভী বাছুরকে চেটে ক্ষত করে ফেলে। ঐ ক্ষত স্থান থেকে এই রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের লক্ষণ:

- নাভীর চারদিকে লাল হয়ে যাবে;
- নাভীর চারদিকে ফুলে যাবে;
- নাভীতে ব্যাথা ও পুঁজ হবে;
- অনেক সময় নাভীতে পোকা পড়ে;
- বাছুর গাভীর দুধ খেতে চাইবে না; এবং
- গাভীর গায়ে জ্বর থাকবে।

রোগের প্রতিকার:

- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ধৌত করে দিতে হবে; এবং
- গাভী যাতে নাভী চাটতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পেটের গোলকৃমি রোগ:

এসকারিয়া নামক এক প্রকার গোলকৃমি দ্বারা গরু এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের চিকিৎসা না করা হলে গরুর, বিশেষ করে বাছুরের স্বাস্থ্যহানীসহ মৃত্যুও ঘটতে পারে।

রোগ বিস্তার:

- আক্রান্ত গরুর মল দিয়ে কৃমির ডিম বের হয়ে ঘাসকে দুষিত করে। সেই ঘাস খেলে এই রোগ হয়;
- আক্রান্ত গাভীর দুধ খেয়ে বাছুরের এই রোগ হয়; এবং
- গাভীর জরায়ুতে ভ্রুণের ভিতরেও এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

- আক্রান্ত গরুর ডায়রিয়া দেখা দেবে;
- অনেক সময় পায়খানা শক্ত হয়ে যাবে;
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেবে;
- গরু দিন দিন শুকিয়ে যাবে ও দুর্বল হয়ে যাবে;
- বাছুরের পেট বড় হয়ে যাবে;
- লোমের চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যাবে; এবং
- বাড়ন্ত গরুর বৃদ্ধি কমে যাবে। বয়স্ক গরুর উৎপাদন কমে যাবে ও রক্ত শূণ্যতা দেখা দেবে।

রোগ প্রতিরোধ:

- গবাদিপশুর গোবর যেখানে-সেখানে না ফেলে এক জায়গায় ফেলতে হবে।
- গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি, পরিস্কার রাখাতে হবে; এবং
- গোয়াল ঘরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা ও জলাবদ্ধ জমিতে গরুকে চরাণো যাবে না।

কলিজার পাতা কৃমি রোগ:

গরুর একটি মারাত্বক কৃমি রোগ। সাধারণত ছাগল, গরু, মহিষ ও ভেড়ার এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগ বিস্তার:

- কলিজা কৃমির লার্ভা শামুকের গায়ে ও স্যাঁতস্যাঁতে বা নিচু জলাভূমির ঘাসের পাতায় লেগে থাকে। এই ঘাস খেলে পশু কলিজা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ:

- বদহজম এবং মাঝে মাঝে ডায়রিয়া দেখা দেবে;;
- থুতনীর নিচে পানি জমে ফুলে যাবে, এ অবস্থা হলে একে "বটল জ" বলে;
- রক্তশূণ্যতা হবে, ফলে চোখের পর্দা সাদা হয়ে যাবে;
- গরু দিনে দিনে শুকিয়ে যাবে; এবং
- তীব্র আক্রমণের ক্ষেত্রে গরু হঠাৎ মারা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ:

- ডোবা, নালা ও বিলের ঘাস খাওয়ানো যাবে না। খাওয়াতে হলে রৌদ্রে একটু শুকিয়ে খাওয়াতে হবে;
- গবাদিপশুর গোবর এক জায়গায় জমা করে রাখতে হবে; এবং
- মাঠের শামুক ধ্বংস করতে হবে।

উকুন; আঁটুলি; মেঞ্জ

লক্ষণ:

- অল্প আক্রমণে তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না। তবে মাঝারি প্রকৃতিতে দীঘমেয়াদী চর্ম প্রদাহ হয়। চুলকানি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ও বাছুরের লোম পড়ে যায়;
- অ্যানিমিয়া, অস্বস্তি বোধ, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দৈহিক ওজন হ্রাস ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। চুলকানি, রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দেখা যায়, আঁটুলি বিভিন্ন রোগের বাহক হয়; এবং
- চর্ম প্রদাহ, চুলকানি, লোম পড়া, খাদ্য গ্রহণে কমে যাওয়া, দুর্বল, স্বাস্থ্যহানি, চামড়া নষ্ট হয় ও পুঁজ সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার:

- গরুর দেহ ব্রাশ করা, গোসল করানো, উকুন হাত দিয়ে মেরে ফেলা;
- গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়া; এবং
- প্রতিদিন গো/মহিষকে ভালভাবে গোসল করানো। নিয়মিত গোসল করালে শরীর সুস্থ থাকে এবং দেহের পরজীবি, যেমন-উকুন, আঁঠালি, মাছি, মাইটস, ফ্লি আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।

রক্ত আমাশয় রোগ: (Coccidiosis)

আইমেরিয়া নামের এক জাতীয় পরজিবী দিয়ে এই রোগ হয়। সময়মত চিকিৎসা না করা হল বাছুর মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার:

- গরুর শোবার জায়গা ময়লা থাকলে এই রোগ হয়;
- গোবর মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়;
- গাভী দোহন করবার সময় ওলান পরিস্কার না করলে ময়লাযুক্ত ওলানের দুধ খেয়ে বাছুরে এই রোগ হয়; এবং
- আক্রান্ত গরুর মলদ্বারা দুষিত খাদ্য ও পানি অন্য গরু খেলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ:

- আক্রান্ত গরু রক্ত মিশ্রিত পায়খানা করে এবং অনেক সময় শুধু রক্ত পায়খানা করে;
- আক্রান্ত গরু পায়খানা করার সময় কোৎ দেয় ও ডাকে;
- লেজের গোড়ায় রক্ত মিশ্রিত গোবর লেগে থাকে; এবং
- ঘন ঘন পানি পান করে, দেহের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অরুচি দেখা দেয়।

প্রতিকার:

- এ রোগের প্রধান প্রতিকার হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

পেট ফাঁপা রোগ: (Tympanitis)

এ রোগ গরুর একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে গরুটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার:

- অধিকমাত্রায় ঘাস/খাদ্য, পানি খেলে এই রোগ হয়;
- অনেকদিন খরা হওয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ার পর কচি ঘাস হয়। সেই ঘাস যদি গরু অধিক পরিমাণে খায় তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে;
- যে সমস্ত গরু খেসারীর ভূষি, মাসকালাইয়ের ভূষির সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি খায় তাদের পেট অতিরিক্ত ভর্তির ফলে এই রোগ হয়;
- যে জমিতে ইউরিয়া সার সদ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেই জমির খাস খেলে এই রোগ হয়; এবং
- গলায় কোন জিনিস/খাদ্য আটকে গেলে বা অসাধারণ খাদ্য বেশি পরিমাণে খেলে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ:

- পেটের ভিতরে গ্যাস জমা হওয়ার ফলে পেট ফুলে যায়;
- পেট ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে গরুর অস্থিরতা ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়;
- পেট ব্যাথার জন্য অনেক গরু প্রায়ই মাটিতে শোয় ও উঠে;
- অনেক সময় পিছনের পা দিয়ে গরু পেটে লাথি মারতে থাকে;
- গরু খুব ঘন ঘন শ্বাস নেয়;
- জিহ্বা বের হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে;
- নি:শ্বাসের গতি খুব বেশি হয় এবং হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে যায়;
- পেটের বাম পার্শ্বে থাপ্পড় দিলে ধপ ধপ শব্দ করে;
- গরুর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়;
- গরুর পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়;
- ঐ ক্ষেত্রে পশুর জ্বর থাকে না।

রোগ প্রতিকার:

- গরুর খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বদহজম রোগ:

এ রোগ গরুর একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে গরুটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার:

- হঠাৎ গরুর খাদ্য পরিবর্তন করলে এই রোগ হয়। যেমন-এক অঞ্চলের গরু অন্য অঞ্চলে নিয়ে গেলে, বাজার হতে গরু কিনে আনলে এইরুপ হয়ে থাকে;
- নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়;
- গাভীর গর্ভফুল অনেক সময় গাভী খেয়ে ফেললে এই রোগ হতে পারে;
- গরুকে পরিমাণ মত পানি না খাওয়ালে এই রোগ হয়; এবং
- অনেকদিন যাবৎ শুধু খড় খাওয়ালে বা অন্য কোন খাদ্য না দিলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ:

- পশুর ক্ষুধা হঠাৎ কমে যায়;
- দুদ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়;
- গরুর মল কঠিন ও পরিমাণ অল্প হয় এবং
- কোন কোন গরুর মাজল শুকনা থাকে।

রোগ প্রতিকার:

- গরুর খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে; এবং
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাইরিয়া: (Diarrhoea)

এ রোগ গরুর একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে গরুটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়। তবে চিকিৎসায় দেরী হলে পানি স্বল্পতায় গরুটি মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার:

- পঁচা ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য গরুকে খাওয়ালে ডায়রিয়া হয়;
- ঘাসের সাথে বালি মিশ্রিত থাকলে সেই ঘাস গরু খেলে এই রোগ হয়;
- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর প্রথমে যে শাল দুধ বাহির হয় সেই বাছুরকে না খাওয়ালে সহজেই ডায়রিয়া হয়;
- অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়;
- খাদ্য ও পানির পাত্র দীর্ঘদিন যাবৎ পরিস্কার না করে সেই পাত্রে খাদ্য ও পানি খাওয়ালে এই রোগ হয়; এবং
- প্রসবের পর গরুর শরীর পরিস্কার না করলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ:

- পাতলা পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে রক্ত ও আম থাকে;
- পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়;
- কখনও কখনও হজম না হওয়া খাদ্যবস্তু পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে;
- পায়খানার রং কালো বা হলুদ হতে পারে;
- ঘন ঘন পায়খানা হতে পারে;
- মলত্যাগের সময় অনেক সময় গরু কোৎ দিতে পারে;
- পাতলা পায়খানার কারণে গরুর দেহে শুষ্কতা দেখা দেয়;
- গরুর পেটের ভিতরে কল কল শব্দ শোনা যায়;
- ক্ষুদামন্দা দেখা দেয়; এবং
- গরু নিস্তেজ হয়ে যায়।

রোগ প্রতিকার

- গরুর খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে;
- নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘাস বা খড় খাওয়ানো যাবে না;
- গরুর খাবারের ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিস্কার করতে হবে;
- গরুকে পুকুর, ডোবা, নালার পানি খাওয়ানো যাবে না, সর্বতা নির্দিষ্ট পরিস্কার পাত্রে বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে;
- গোয়াল ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সকল সময় শুকনা রাখতে হবে; এবং
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

গর্ভফুল আটকে যাওয়া:

এ রোগ গরুর একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে গরুটি সহজেই সুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার:

- অপরিণত বাচ্চা প্রসব (সময়ের পূর্বেই বাচ্চা হওয়া);
- সংক্রামক রোগ, যেমন ব্রুসেলোসিস; এবং
- দৈহিক দুর্বলতা, ক্যালসিয়ামের অভাব।

রোগের লক্ষণ:

- গর্ভফুল যোনী মুখে ঝুলে থাকে;
- গর্ভফুল ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাহির হয় না;
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা; এবং
- জ্বর হতে পারে।

প্রতিকার:

- ২৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা; এবং
- কোন অবস্থাতেই ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভফুল হাত দিয়ে টেনে বের করা যাবে না। কারণ এর ফলে গাভী বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

দুধ জ্বর রোগ: (Milk Fever)

রোগের কারণ:

- রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে এই রোগ হয়;
- মাথা ও পা কাঁপতে থাকে এবং পশু একস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চায়;
- চলতে গেলে টলতে থাকে, বিশেষ করে পিছনের পায়ে জোর কমে যায়;
- গরু নিস্তেজ হয়ে দেহের একপাশে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে;
- মাজল শুকনা থাকে;
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়; এবং
- হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কমে যায়।

প্রতিকার:

- গরুর খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে এবং
- সময়মত চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে।

গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

আমাদের দেশীয় গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সাধারণত তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরুপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ গরুকে পর্যান্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য (কুড়া, গমের ভুষি, চাউলের খুদ, খৈল, কলাই মটর, খেশারী, কুড়া ইত্যাদি), পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্কার পানি (নলকুপের টাটকা পানি) সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাধারণ খাদ্য হল খড়, যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুণে বেড়ে যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি);
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিল খৈল, শুটকি মাছ, মিটমিল, ইত্যাদি);
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (অ্যানিমেল ফ্যাট, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি);
- ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (শাকসবজি ও কৃত্রিম ভিটামিন);

- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট,লবন, ইত্যাদি); এবং
- পানি: দেহ কোষে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন গরু খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
    - ➢ সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে;
    - ➢ অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অক্সিডিশিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; এবং
    - ➢ দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।

    গরুর দেহে পানির কাজ:

    - ❖ খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সাহায্য করে;
    - ❖ খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে;
    - ❖ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে;
    - ❖ দেহের ভেতরের দুষিত পদার্থ অপসারণ করে; এবং
    - ❖ দেহের গ্রন্থি হতে নি:সৃত রস, হরমোন, এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

গরুর খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন:

১. আশঁ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন: খড়,সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি;
২. দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন: চালের কুঁড়া, গমের ভূষি,খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদারম খৈল, ইত্যাদি; এবং
৩. সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন: খনিজ উপাদান, ভিটামিন, ইত্যাদি।

- শুকনা খড়: একটি দেশী গাভীকে দৈনিক ৩ কেজি খড় খাওয়াতে হয়। উন্নত শংকর জাতের একটি গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি খড় প্রয়োজন হয়। খড় কেটে ও কাটা খড়ের ১০% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ালে পুষ্টির মান বেড়ে যায়। খড়ে প্রোটিনের ভাগ বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়াতে হবে।

- সবুজ কাঁচা ঘাস: গাভীর সুষম খাদ্যের প্রধান অংশ সবুজ কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস গাভীর দুদ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তাই দুদ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রতিদিন ১০-১২ কেজি কাঁচা ঘাস অবশ্যই যোগ করতে হবে। একটি উন্নত শংকর জাতের গাভীকে দৈনিক ১৫ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়।

    - বিভিন্ন জাতের সবুজ কাঁচা ঘাস:
      -স্থায়ী ঘাস: গ্রীষ্ম কালীন স্থায়ী ঘাস যেমন-নেপিয়ার, পারা, গিনি, জার্মান, ইত্যাদি।
      -অস্থায়ী ঘাস: শীতাকালীন ঘাস যেমন-ওটস, ভুট্টা, ইত্যাদি।
      -শুটি জাতীয় ঘাস: খেসারী, মাসকলাই, কাউপি, সেন্ট্রোশিমা, বারশিম, লুসার্ন, ইত্যাদি।

- দানাদার খাদ্য মিশ্রণ: গাভীর প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ৩ কেজি এবং পরবর্তী ৩ লিটারের জন্য ১ কেজি করে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা:

দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা	
(ক) চালের কুঁড়া	২ কেজি
(খ) গমের ভূষি	৫ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১.৮ কেজি
(ঘ) তিল বা বাদাম খৈল	১ কেজি
(ঙ) লবণ	০.১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.১ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

- পানি সরবরাহ: গাভীকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। একটি দুধাল গাভীকে দৈনিক ৩৫-৪০ লিটার পানি সরবরাহ করতে দিতে হবে।

গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য প্রস্তুত করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয় বিবেচনায় এনে খাদ্য তৈরি করতে হবে:

১. গাভীর খাদ্য সুষম হতে হবে, অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে;

২. খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হতে হবে। অর্থাৎ সহজ প্রাপ্য এবং দাম কম এরুপ উপকরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে;

৩. একটি দেশী গাভীর চেয়ে উন্নত জাতের একটি গাভী অনেক বড় হয়। দুধও বেশী দেয় এবং সেজন্য খায়ও বেশী। তাই খাদ্য প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে গাভীর পেট ভরে এবং পুষ্টির অভাবও পূরণ হয়;

৪. গাভীর খাদ্যদ্রব্য টাটকা ও পরিস্কার হতে হবে। ময়লা, কাঁকড়, পাথর, বালু মাটি, ছাতাপড়া দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য গাভীকে খেতে দেওয়া যাবে না;

৫. কাঁচা ঘাসে প্রচুর খনিজ উপাদান ও ভিটামিন থাকে যা সহজে হজম হয়। তাই গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে;

৬. গাভীর দেহ গঠনে, দুধ উৎপাদনে, গর্ভধারনে, বাচ্চা উৎপাদনে খনিজ ও ভিটামিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই দুদ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করতে হবে;

৭. দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে এগুলোর অভাব হবে না;

৮. আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন: খড়, কাঁচা ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে গাভীকে খাওয়াতে হবে। এতে খাদ্য দ্রব্যের অপচয় হবে না। গাভীর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমেও সহায়ক হবে;

৯. খড় কুচিকুচি করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে অন্যান্য দানাদার মিশ্রণ ও চিটাগুড় মিশিয়ে দিলে গাভী খেতে অধিক পছন্দ করবে এবং সহজ প্রাচ্যও হবে; এবং

১০. খাদ্য উপকরণ হঠাৎ করে পরিবর্তন করা উচিত হবে না। খাদ্য উপকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে করতে হবে।

গবাদি প্রাণীর খাদ্যে দৈনিক খড়, কাঁচা ঘাস ও ইউ.এম.এস সরবরাহের পরিমাণ:

- ৩ কেজি কাঁচা ঘাস = ১ কেজি খড়;
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ৮ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন;
- ১-৩ বছরের একটি গরুকে ২ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন;
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ১ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন;
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ১৫-২০ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন;
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ৩ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন; এবং
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি ২-৩ কেজি ইউ.এম.এস (প্রক্রিয়াজাত খড়) সরবরাহ করা প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহের পরিমান:

- একটি গাভীকে প্রথম ৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ৩ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে এবং
- পরবর্তী প্রতি ১ লিটার দুধ দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৫০ কেজি হারে সর্বমোট ৮ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ:

ইউ.এম.এস তৈরির প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলোর অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস (চিটাগুড়) এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ কেজি মোলাসেস (চিটাগুড়) ও ৩ কেজি ইউরিয়া মেশালেই চলবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণেই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড় ,মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না, আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়।

এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরি খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

গরুকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা:

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্ধ্বে বাছুর গরু থেকে শুরু করে সকল বয়সের গরুকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়;
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়;
- ইউ.এম.এস তৈরির পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরি করতে পারেন;
- গবেষণা করে দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকার গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব;
- গরু যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই গরুর বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই; এবং
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মান কমে যাবে।

গরুকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা:

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের বাছুরকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

গরুকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন:

- ইউ.এম.এস তৈরি করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে এবং
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না।

গরুকে কোন কোন অবস্থায় ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না:

নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় গরুকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না-

- ৬ মাসের কম বয়সের বাছুর গরুকে;
- অসুস্থ গরুকে;
- গরুকে সালফার জাতীয় ঔষধ খাওয়ানোর পর অন্তত: পরবর্তী ১৫-৩০ দিন;
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভকালীন অবস্থার শেষের দিকে; এবং
- যে সকল গরু ইউ.এম.এস খাওয়ালে প্রায়ই অসুবিধা বোধ করে বা এলার্জি দেখা দেয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পশুর অন্যান্য যত্ন:

খাদ্য পরিবেশনার উপরও গরুর খাদ্য গ্রহণের তারতম্য হয়। তাই খাদ্য পরিবেশনে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন:

- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা;
- গরুর সম্মুখে সর্বদা খাদ্য রাখা;
- খাদ্য সরবরাহের আগে অবশ্যই পাত্র পরিস্কার করা;
- দানাদার খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে ২ বারে (সকালে ও বিকালে) পরিবেশন করা;
- দানাদার খাদ্য আধা ভাঙ্গা অবস্থায় ভিজিয়ে খেতে অভ্যস্ত হলে সেভাবে দেয়া;
- শুকনা দানাদার খাদ্য দিলে গ্রহণের পরপরেই পানি দেয়া;
- খড় কেটে ভিজিয়ে পরিবেশন করলে কম নষ্ট হয় এবং খাদ্যের গ্রহণের হারও বাড়ে; এবং
- খাদ্য অবশ্যই মাটি/বালি মুক্ত থাকা, খাদ্য পচা, বাসি, অতি পুরাতন না হওয়া।

গরুকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস খাওয়ালে উপকারিতা:

- অধিক দুধ পাওয়া যাবে;
- খাদ্য খরচ কম হবে;
- গাভী সুস্থ-সবল বাছুর জন্ম দেবে;
- সঠিক বয়সে যৌন পরিপক্কতা আসবে;
- জন্মের সময় বাচ্চার মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে;

- গাভীর মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে;
- দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হবে, ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে;
- জন্ম নেয়া বাছুরের দৈহিক ওজন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যাবে;
- রোগ-ব্যধি কম হয় ফলে ঔষধ খরচ কমে যাবে এবং চিকিৎসা খরচ খুবিই কম হবে;
- দুধ উৎপাদন বেশী হলে গরিব কৃষক দুধ বিক্রয়ের পাশাপাশি নিজেরাও দুধ খেতে পারবেন এবং নিজেরাও সুস্থ সবল থাকবেন; এবং
- এক একর জমিতে ধান চাষ করে যে লাভ পাওয়া যায়, ঘাস চাষ করলে তার চেয়েও বেশী লাভ পাওয়া যাবে।

গরুকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস না খাওয়ালে অপকারিতা:

- দুধ উৎপাদন কম হবে;
- গরু অপুষ্টিতে ভোগে এবং রোগ-ব্যাধি বেশী হবে;
- গাভির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং ঘন ঘন প্রজনন করতে হবে;
- গর্ভপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে;
- দুর্বল ও কম ওজনের বাছুরের জন্ম হবে। ফলে বাছুরের মৃত্যু হার বেড়ে যাবে;
- যৌন পরিপক্কতা দেরিতে আসবে;
- দুর্বলতার কারণে রোগ-ব্যধি বেশী হওয়াতে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাবে;
- রোগ হলে উৎপাদন কমে যাবে ফলে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রহস্ত হবে;
- বাছুরের পরবর্তীতে আশাতিত ওজন পাওয়া যাবে না এবং উক্ত বাছুর থেকে আশানুরুপ উৎপাদনও পাওয়া যাবে না; এবং
- দানাদার খাদ্য বেশী দরকার হয় ফলে গাভী পালনের খরচ বেড়ে যায়।

গাভীর প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা:

গবাদি পশুর বংশ বিস্তারের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটলে বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে দুগ্ধ খামারের প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অন্যতম প্রধান সমস্যা বন্ধ্যাত্ব। বন্ধ্যাত্ব হলে গাভী সময়মত গরম হবে না, বীজ দিলে গর্ভধারণ করবে না. একবার বাচ্চা দিলে ঋতুচক্র প্রদর্শন করতে সময় বেশী লেগে যাবে, ইত্যাদি। দুগ্ধ খামারে এসকল সমস্যার যে কোন একটি দেখা দিলে উক্ত দুগ্ধ খামার থেকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই গাভী/বকনা এর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে খামার মালিকদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

একটি আদর্শ বকনা/গাভীর বৈশিষ্ট্য:

- একটি আদর্শ বকনা/গাভীর জন্য জন্মের পর থেকেই বাছুরকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে দেশী জাতের বকনা বাছুর ২৪-৩৬ মাস এবং সংকর জাতের বকনা বাছুর ১০-১৮ মাস বয়স থেকেই ডাকে আসে। তবে বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ১৮-২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম;
- সুস্থ অবস্থায় বকনা/গাভীর ডাক থাকে ১২-২৪ ঘন্টা,তবে ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করা উত্তম;
- বকনা/গাভী গর্ভধারণ না করলে দুই ঋতুচক্রের ব্যবধান হবে ২১ দিন;
- বকনা/গাভী গর্ভধারণ/গর্ভকালীন সময় হবে ২৮০+১০ দিন;
- জন্মের সময় বাছুরের ওজন হবে ১৫-১৮ কেজি;
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর দুধ প্রদানের সময়কাল হবে ২৮৫-৩০৫ দিন;
- বাছুর এর দুধ সেবনকাল হবে ১৮০ দিন;
- প্রসব পরবর্তী প্রথম প্রজননের সময় হবে ৬০-৯০ দিন; এবং
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর পরবর্তী বাচ্চা উৎপাদনকাল হবে ৩৭৫-৪০০ দিন।

বকনা/গাভী ডাকে আসা/গরম হওয়ার লক্ষণ:

- বকনা/গাভী অস্থির থাকবে এবং জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে;
- বকনা/গাভীকে খুব সর্তক মনে হবে এবং কান খাড়া রেখে সর্তকতা প্রকাশ করবে;
- ঘন ঘন হাম্বা হাম্বা করে ডাকবে;
- ডাকে আসা বকনা/গাভী অন্য গরুর উপর লাফিয়ে উঠার প্রবণতা দেয়া দেবে;
- ঘন ঘন ও অল্প অল্প প্রস্রাব করবে;

- খাদ্য গ্রহণের প্রতি অনিহা ভাব থাকবে;
- বার বার লেজ নাড়া বা লেজ ডানে/বায়ে সরিয়ে নেবে;
- যোনি মুখ হালকা ফুলে যাবে বা ঈষৎ সরিয়ে নেবে;
- যোনির পথ দিয়ে জেলীরমত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা মিউকাস বের হবে; এবং
- দুধাল গাভী ডাকে আসার সময় হঠাৎ করে দুধ কম দেবে।

গাভীর প্রজনন কার্যক্রম:

যে কোন গরুর বংশ বিস্তার ঘটে প্রজননের মাধ্যমে। এই প্রজনন প্রক্রিয়া দু'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে-

১. **প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি**-এই পদ্ধতিতে ষাঁড়ের দ্বারা গাভীকে সরাসরি প্রজনন করা হয় এবং
২. **কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি**- এই পদ্ধতিতে ষাঁড় থেকে সরাসরি বীজ সংগ্রহ করে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে গাভী গরম হলে উক্ত বীজ দিয়ে কৃত্রিমভাবে গাভীকে প্রজনন করা হয়।

কৃত্রিম প্রজনেনর সুবিধা:

- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দিয়ে দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে প্রাণীর উন্নত জাত তৈরি করা সম্ভব হয়;
- এ পদ্ধতিতে শুক্রানুর গুণাগুণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং অনুর্বর ষাঁড় বাতিল করা সহজ হয়;
- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়;
- একটি ষাঁড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন/বীজ দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়, ফলে বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না;
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কম খরচে অনেক বেশী গাভীকে পাল দেয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে একটি ষাঁড়ের সারা জীবনের সংগৃহিত সিমেন/বীজ দ্বারা প্রায় ১-১.৫ লক্ষ গাভীকে প্রজনন করা সম্ভব হয়;
- প্রজনন কার্যক্রম সহজ হয়, অর্থাৎ যে কোন সময় যে কোন স্থানে কৃত্রিম প্রজনন করা যায়;
- প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজননে ষাঁড়ের মাধ্যমে একটি গাভী থেকে অন্যান্য গাভীর মধ্যে বিভিন্ন যৌন রোগ সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর যৌন রোগ সংক্রমন সহজেই রোধ করা সম্ভব হয়;
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়;
- বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড় না এনে প্রয়োজনে অল্প খরচে উক্ত ষাঁড় এর সিমেন/বীজ আমদানী করা যায়;
- প্রাকৃতিক প্রজননে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড় থেকেও সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়; এবং
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক ও অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সংগঠিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

কৃত্রিম প্রজননের উপকারিতা:

- প্রাকৃতিক প্রজননের সম্ভাব্য যৌন রোগ থেকে গাভীকে রক্ষা করা যায় এবং
- সহজেই উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদন করে অধিক দুধ/মাংস উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতা:

- সুষ্ঠ প্রজননের জন্য সিমেন/বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়;
- গর্ভবতী গাভীকে ভুলক্রমে জরায়ুর গভীরে প্রজনন করালে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভবনা থাকে;
- গাভীর উত্তেজনা কাল সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করতে হয়;
- প্রজননের জন্য রক্ষিত ষাঁড়ের জন্য বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়; এবং
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়।

প্রজনন পরবর্তী নজরদারী:

বকনা/গাভীকে প্রজনন করার পর পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রজননকৃত প্রাণীটি যদি গর্ভধারণ করে থাকে তাহলে এ ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। আর যদি গর্ভধারণ না করে থাকে তাহলে ২১ দিন পর পুণরায় ডাকে আসার সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। অনেক সময় বকনা/গাভী গর্ভধারণও করেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রজননকৃত বকনা/ গাভীকে ৩ মাস পর ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। গর্ভধারণ না করলে খাবার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পুনরায় হিটে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আর গর্ভধারণ করলে গর্ভবতী বকনা/গাভীর সুষ্ঠু পরিচর্যা করতে হবে।

গর্ভবতী বকনা/গাভীর পরিচর্যা:

- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে তার স্বাভাবিক প্রসব, পূর্ণ মাত্রায় দুধ উৎপাদন ও পরবর্তীতে সময়মত ডাকে আসা ও গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা থাকে;
- গর্ভধারণের ৭ মাস পর্যন্ত তার খাদ্য, দুধ দোহন ও অন্যান্য পরিচর্যা স্বাভাবিক নিয়মে চলবে;
- গর্ভধারণের ৭ মাস পর থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে পর্যাপ্ত আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে রাখতে হবে যাতে গাভীটি উক্ত ঘরে সহজেই নড়াচড়া করতে পারে;
- গর্ভবতী বকনা/গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় বা তার উপর অন্য কোন প্রাণী লাফিয়ে না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- গর্ভবতী প্রাণীর স্বাভাবিক প্রসব ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে গর্ভবতী বকনা/গাভীর অবস্থার উপযোগী খাদ্য, দুধ গোহন ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে;
- অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে রক্ষা করতে হবে;
- ঘরের মেঝেতে শুকনা পরিষ্কার খড় সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে প্রাণীটি আরাম করে শুতে পারে। ঘরের মেঝেতে এ জন্য প্রায়োজনে ফ্লোর ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে;
- মশামাছির উপদ্রব হতে প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে;
- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে প্রত্যহ সবুজ কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য ও প্রচুর পরিমান পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে; এবং
- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে শীতের সময় পানি কুসুম গরম করে খেতে দিতে হবে এবং গরমের দিন হলে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।

গর্ভধারণের শেষের দিকে গাভীর দোহন বন্ধকরণ ও উহার সুফল:

- দুগ্ধবতী গাভীকে গর্ভধারণের ৮ মাস পর্যন্ত দুধ দোহনের পর দোহন বন্ধ করতে হবে;
- এ সময়ে দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানাদার খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে দুধ দোহন বন্ধ করার প্রথম ১-২ দিন খাদ্য তালিকায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। তাহলে ওলানে দুধ প্রবাহে বন্ধ হতে সহায়তা;
- দুধ দোহন বন্ধ না হলে নবজাত বাছুর অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্বল হবে এবং গাভীর পরবতী দোহনে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে;
- দুধ বন্ধ হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে প্রসবের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে গাভীর খাদ্যের পরিমান আস্তে আস্তে হ্রাস করতে হবে এবং সহজে হজম হয় এমন খাদ্য খাওয়াতে হবে ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে; এবং
- গাভীর প্রতি প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

গাভীর প্রসবকালীন লক্ষণ:

- গাভীর ওলান বড় হয়ে যাবে ও বাঁট দিয়ে দুধ জাতীয় তরল পদার্থ বের হবে;
- যোনিমুখ বড় হয়ে ঝুলে যাবে এবং নরম ও ফোলা থাকবে;
- পেট ঝুলে পড়বে ও লেজের গোড়ার দুই পাশের স্থানে গর্তের মত হবে;
- যোনিমুখ দিয়ে আঠাল তরল পদার্থ নির্গত হবে ও গাভী ঘন ঘন প্রস্রাব করার চেষ্টা করবে; এবং
- চুড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

গাভীর প্রসবকালীন পরিচর্যা:

- গাভীর বাচ্চা যখন প্রসবের সময় হয় তখন গাভীকে একটি উন্মুক্ত নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে;
- গাভীর প্রসবের স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পরিস্কার শুকনা খড় বিছিয়ে দিতে হবে;
- গাভীকে লোক চোখের আড়ালে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে এবং অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে;
- প্রসবের সময় যেন কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ইত্যাদি কাছে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রসূত বাচ্চার সামনের দু'পা তার মধ্যে মাথাসহ বেরিয়ে আসবে। তারপর সমস্ত শরীর বেরিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে;

- প্রসবকালীন সময়ে গাভী বারবার উঠা-নামা করবে। এ সময় অতি সাবধানে বাছুরের সামনের দু'টি পা ও মাথাকে ধারে আস্তে আস্তে টেনে ভূমিষ্ঠ করাতে হবে;
- স্বাভাবিক প্রসব না হলে সাথে সাথে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- প্রসব হয়ে গেলে বাছুরকে গাভীর সামনে দিতে হবে, যাতে গাভী বাছুরের শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে।

প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা:

- প্রববের পর গাভীর পিছনের অংশ জীবানুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- আবহাওয়া বেশী ঠান্ডা হলে গাভী ও বাছুরের জন্য উষ্ণতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রসবের পরপরই একটি বালতিতে কুসুম গরম পানির সাথে দেড় কেজি গমের ভুষি, আধাকেজি চিটাগুড়, ৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে গাভীকে খেতে দিতে হবে। এরুপ খাদ্য খাওয়ালে গাভীর গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে সহায়তা করবে। তাছাড়া কুসুম গরম পানিতে শুধু ঝোলাগুড় মিশিয়েও গাভীকে খাওয়ানে যেতে পারে।
- প্রসবের পরপরই ওলান ঈষৎ উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- গাভীর শাল দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। শাল দুধের সাথে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাওয়ার ফলে গাভীর ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ মিল্ক ফিভার হতে পারে। এজন্য গাভীকে প্রচুর কাঁচা সবুজ ঘাস এবং খনিজ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- সাধারণত বাচ্চা জন্মানোর ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসবকৃত গাভীর ফুল (Placenta) বের হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রসবের ১/২ দিন আগ থেকে রাত্রে পাহারা দিতে হবে, কেননা রাত্রে প্রসব হয়ে গেলে গর্ভফুল পড়া মাত্র গাভী তা খেয়ে ফেলতে পারে। গাভী গর্ভফুল খেলে গাভীর স্বাস্থ্যহানী হবে ও দুধ উৎপাদন কমে যাবে। সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

গাভীর দুধ দোহনঃ

- গাভী দোহনের আগে ও পরে গাভীর ওলান, তলপেট ও আশ-পাশ ঈষৎ উষ্ণ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মুছে দিতে হবে;
- বাছুরকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে, এতে গাভী দেরীতে দুগ্ধহীনা হয়। বাছুর বাঁট চুষলে এক ধরনের স্টিমুলেশন হওয়ায় দুগ্ধ দানের হরমোন নি:সৃত হয়;
- গাভীকে খালী পেটে দুধ দোহন করতে হবে। কেননা ঘাস পানি খেয়ে পেট পূর্ণ হওয়ার পর দুধ দোহন করলে গাভী ওলান ফুলা রোগে আক্রান্ত হতে পারে;
- দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধের পানি দিয়ে গাভীর বাট স্পঞ্জ করলে ভাল হয়। এতে সহজে ওলান ফুলা রোগ হয় না; এবং
- গাভীর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও শোবার জায়গায় পরিষ্কার শুকনা খড়ের নরম বিছানা করে দিতে হবে। ঘরের মেঝেতে প্রয়োজনে ফ্লোর ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে।

বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব ও প্রতিকারঃ

বাচ্চা উৎপাদনের অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা বলে। বিভিন্ন কারণে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যেতে পারে। যেমনঃ

১. শারীরিক গঠন জনিত কারণঃ শরীরের অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হতে পারে, যেনন-ডিম্বাশয়, সার্ভিক্স ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা;

২. দূর্ঘটনা জনিত কারণঃ প্রজনন তন্ত্রে যে কোন ধরনের আঘাতের ফলে অথবা জরায়ুর বহির্গমন, যোনীর বহির্গমন ইত্যাদির কারণে গাভী বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বর হতে পারে;

৩. শরীরবৃত্তীয় কারণঃ বিভিন্ন হরমোনের অভাব ও অনিয়মিত ক্ষরণের ফলে গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দেয়। যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন, প্রোজেষ্টেরন হরমোন ইত্যাদি। তাছাড়াও ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রোগ যেমন- পারসিস্টেন্ট করপাস লিউটিয়াম, সিষ্ট, ফলিকুলার এট্রিফি, ইত্যাদি;

৪. পুষ্টিগত কারণঃ সুষম খাদ্যের অভাবে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন-ভিটামিন-এ,ডি,ই ও খনিজ পর্দাথের মধ্যে ফসফরাস,কপার কোবাল্ট ইত্যাদির অভাব। সবুজ/কাঁচা ঘাস না খাওয়ালেও বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হতে পারে;

৫. মনস্তাত্বিক কারণঃ ভয় বা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ফলে গরুর গর্ভধারণ বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে বকনার ক্ষেত্রে প্রজনন ভিতি বা অস্থিরতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে;

৬. রোগ জনিত কারণঃ বিভিন্ন সংক্রামক যৌন রোগ যেমন-ব্রুসেলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিসি, লেপটোসপাইরোসিস ইত্যাদি অথবা প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য রোগ যেমন- মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, পায়োমেট্রা, সালফিনজাইটিস ইত্যাদির কারণে বকনা/গাভী বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বর হতে পারে। এ সমস্ত রোগ প্রজনন ষাঁড় থেকেও বকনা/গাভীতে সংক্রামিত হতে পারে;

৭. বংশতগত কারণঃ অনেক সময় বংশগত কারণে গরুর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়;

৮. ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাঃ লালন পালন ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে। যেমন-অযত্ন-অবহেলা, ত্রুটিপূর্ণ বাসস্থান, অপর্যাপ্ত খাদ্য, সবুজ/কাঁচা ঘাস না দিলে, অনিয়মিত দুধ দোহান, প্রসবকালীন অবহেলা ইত্যাদি। অদক্ষহাতে/অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কৃত্রিম প্রজনন বা বাচ্চা প্রসব করানোর ফলে গাভীর জরায়ু সংক্রামিত হয়ে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে; এবং

৯. অন্যান্য কারণঃ বিভিন্ন বিষয় যেমন-প্রাণীর বয়স, ঋতু, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদি গরুর উর্বরতা উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত: ৪ বছর বয়স পর্যন্ত গাভীর উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ৬ বছর পর্যন্ত তা বিরাজমান থাকে। কিন্তু ৬ বছর পর থেকে উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে।

গাভীর বন্ধ্যাত্বের লক্ষণঃ

- বাচ্চা প্রসবের ৯০- ১০০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হওয়া;
- সব সময় গরম থাকা বা অনিয়মিতভাবে গরম হওয়া;
- ১৫ দিনের কম সময় বা ২৮ দিনের বেশি সময় পর পর গরম হওয়া;
- দীর্ঘদিন অর্থ্যাৎ এক বছর বা অধিক সময়কাল গরম না হওয়া;
- স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে ঘোলা, পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হওয়া;
- গর্ভপাত হওয়া;
- তিন বারের অধিক প্রজননের পরেও গর্ভধারণ না করা; এবং
- গর্ভফুল না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন ইত্যাদি।

বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারের উপায়ঃ

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করতে হবে;
- গাভীকে সুষম খাদ্য ও সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে;
- সঠিকভাবে গাভীর গরমকাল নির্ধারণ করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রজনন তন্ত্রে কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রসবের সময় সঠিক যত্ন নিতে হবে;
- প্রসবের পর ৬০-৯০দিন পর গাভীকে পুনরায় প্রজনন করাতে হবে;

বাছুরের পরিচর্যাঃ

ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাছুরকে যথাযথভাবে লালন পালন করতে হবে। বাছুরের যত্ন মূলত গাভী গর্ভবতী থাকা অবস্থা থেকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবারাহ করতে হবে। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। তাই গাভী প্রসবের প্রাক্কালে গাভীকে অব্যশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে;
- স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;

- জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাম ও মুখ মন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গাভী যেন তার নবজাত বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে;
- যদি বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীকে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়;
- জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকর, নাভী ফুলা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না;
- গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে অথবা শুকনো খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাছুরের শরীর ভালভাবে মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচিন হবে না। কারণ, পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- নবজাত বাছুরকে ১-২ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়াতে হবে এই শাল দুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যা বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমান কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো উচিত। নতুবা এর হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে; এবং
- বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময়মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

- বাছুরের জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে যতটুকু পুষ্টিসাধন করা হবে পরবর্তী জীবনকালের বৃদ্ধি ও উৎপাদন তার উপর সিংহভাগ নির্ভর করবে;
- জন্মের প্রথম দিন থেকে সাধারণত; ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সমেয়ে যদি শরীরে পুষ্টির অভাব হয়, তবে এর যৌনাঙ্গের বিকাশ ও যৌবন প্রাপ্তি দেরিতে আসবে। ফলে ভবিষ্যতে গর্ভধারন ও বাচ্চা উৎপাদনও কম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাছুর পুষ্টির অভাবে রোগক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে। এসব কারণে জন্মের পর থেকেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন;
- জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ বাছুর জন্মানোর আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, বাছুরের ওজন ১০ কেজি হলে ১ কেজি শাল দুধ, বাছুরের ওজন ২০-২৫কেজি হলে ১.২-১.৫ কেজি হলে শাল দুধ খাওয়াতে হবে;
- বাছুরকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে। এতে গাভী বেশি দুধ দিবে এবং গাভী দেরীতে দুধ দেয়া বন্ধ করবে;
- সাধারণতঃ দু'বেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে; এবং
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন। তা করা না হলে বাছুরকে হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।

জন্ম থেকে দুধ ছাড়া পর্যন্ত বাছুরকে দুধ, দানাদার ও ঘাস সরবরাহ এর পরিমাণঃ

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
০-৭ দিন (১ম সপ্তাহ)	২ লিটার	এ বয়সে দানাদার ও খড় ঘাসের প্রয়োজন নেই।
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	দানাদার খাদ্য অর্থ্যাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য়- ১২ সপ্তাহ (৩ মাস)	৪ লিটার	• দৈনিক ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১ কেজি হারে উচ্চ মানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৩-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	• দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

১৭-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাচা নরম ঘাস দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
২১-২৪ সপ্তাহ (৬মাস)	১ লিটার	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাচা নরম ঘাস দিতে হবে। ৬ মাস এর পর থেকে বাছুরকে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় না। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

- বাছুরকে অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হবে এবং বাছুর দুর্বল হয়ে পড়বে। এসময়ে বাছুরের চিকিৎসা না করলে বাছুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ খাওয়ানো শুধু পেট খারাপ নয়, অপচয়ও বটে। ছয় মাসের উর্ধ্বে বাছুরকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে। তবে এ সময়ে তাদেরকে পরিমাণমত দানাদার খাদ্য, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ করতে হবে।

ছয় মাসের উর্ধ্বে বাছুরকে দুধ, দানাদার, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ এর পরিমানঃ

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে।	● দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। ● বাছুর গরুর বয়স ছয় মাস পার হলে তার ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ		● দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১০-১২ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও ১-২ কেজি খড় দিতে হবে। ● দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। ● বাছুর গরুর ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

<u>বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ফরমূলা</u>

১. গমের ভুষি	৪০%
২. ডালের ভুষি	১৫%
৩. ছোলা ভাংগা	১০%
৪. তিলের খৈল	১৫%
৫. মাটি কলাই ভাংগা	১০%
৬. ভুট্টা ভাংগা	৫%
৭. খনিজ দ্রব্য	৪৫
৮. লবণ	১%
	মোট= ১০০%

বাছুরের বাসস্থানঃ

বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। অনেক বাছুর এক সাথে থাকলে দুর্বল বাছুরগুলো আরও দূর্বল হয়ে পড়ে। কারণ দূর্বলগুলো সবলদের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রয়োজনমত খেতে পারে না।

- বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন;
- বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে;
- ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে;
- গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে;
- ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের জন্য পাত্র রাখতে হবে; এবং
- বাছুরের ঘর স্যাঁতস্যাঁতে ময়লা আবর্জনাময় হলে বাছুরের শ্বাস কষ্ট হয়;

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাছুরকে তিন দলে ভাগ করে বাছুরের বাসস্থান করা প্রয়োজনঃ

১. এক বছরের কম বয়সী।
২. এক বছরের বেশী বয়সী বকনা বাছুর।
৩. এক বছরের বেশী বয়সী এঁড়ে বাছুর।

বাছুরের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার:

১. সংক্রামক রোগঃ

- সাদা বাহ্য বা কাফ স্কাওয়ার, নেভাল ইল বা নাভীর রোগ, সালমোনেলোসি, নিউমোনিয়া, বাদলা, তড়কা, ধনুস্টংকার, ক্ষুরা, জলাতংক, ইত্যাদি। এ সকল রোগ দমনে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. কৃমি বা পরজীবীজনিত রোগঃ পরজীবী সাধারণত দুই ধরনের-

- দেহাভ্যন্তরের পরজীবী/কৃমিঃ গোল কৃমি, ফিতা কৃমি, পাতা কৃমি এ সকল রোগ দমনে বাছুরকে দু'মাস বয়স হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কুমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো আরাম্ভ করতে হবে।
- বহিঃদেহের পরজীবীঃ এগুলোকে দেহের পোকা বলা হয়। এরা বাছুরের ত্বকে বাস করে ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। বহিঃদেহের পরজীবীর মধ্যে বাছুরের আঁঠালি, উকুন, মাছি, মাইটস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহিঃদেহের পরজীবী দমনে বাছুরের শরীর ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।
- বাছুরের বয়স ৬ মাস হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বহিঃদেহের পরজীবী ধ্বংসকারী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. প্রোটজোয়াজনিতঃ

- প্রোটজোয়া এক প্রকার এককোষী প্রাণী। বাছুর বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া রয়েছে, যেমন- বেবেসিয়া, এনাপ্লাজমা, ককসিডিয়া, ইত্যাদি। তবে বাছুর সাধারণতঃ ককসিডিয়া নামক প্রোটোজোয়ার আক্রমণ বেশী হতে দেখা যায়।
- এ রোগ দমনে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সাধারণ রোগ-ব্যাধিঃ

- নবজাত বাছুরের সাধারণ রোগঃ নবজাত বাছুরের সাদা উদরাময় রোগ (Calf Scours), বাছুরের নাভি ফোলা রোগ।
- অন্যান্য বাছুরের সাধারণ রোগঃ বিষক্রিয়াজনিত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ যেমন-পেট ফাঁপা, উদারাময়, কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং বিপাকীয় রোগ।
- এ সকল রোগের চিকিৎসাও ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে।

গরুর রোগ প্রতিরোধ বা ভেক্সিনেশন সিডিউল:

টিকা বীজ	প্রয়োগ স্থান	রোগ প্রতিরোধ মেয়াদ	মন্তব্য	বাছুরের পরিচর্যা
তড়কা	চামড়ার নীচে	১ বৎসর	১ বৎসর পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে।	৬ মাস বয়সে বাছুরকে রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
গলা ফুলা	ঐ	৬ মাস	৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে।	
বাদলা	ঐ	৬ মাস	৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে।	
ক্ষুরা রোগ	গলার দুপাশে চামড়ার নীচে মাংসপেশিতে	৪/৬ মাস	প্রথম টিকার ৪ সপ্তাহ পর পুনঃ প্রয়োগ করলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।	বাছুরের জন্য কৃমি রোগের ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
গো-বসন্ত	ঐ	১ বৎসর	প্রথম টিকাদানের ১ বৎসর পর পুনঃটিকা প্রয়োগ প্রয়োজন।	সঠিকভাবে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে।
জলাতংক (কামড়ানোর পূর্বে)		১ বৎসর	গরু অসুস্থ হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।	

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

১. গবাদি গরু ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গরুকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেন থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. গরুর রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত গরুর চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৪. গরুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, গরু খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।

৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দুর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোষ্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদন হওয়ায় দুষণমুক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোষ্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও গরুর রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।